উল্টোরথ

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

আমার ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামে নতুন একঘর লোক এসে বাস করলো। আমি সেবার মামার বাড়ি গিয়েছিলাম ছ'সাত মাসের জন্যে। এসে দেখি রামেশ্বর চক্রবর্তীদের ভিটের পশ্চিম-পাড়ে যে নিবিড় জঙ্গল ছিল, তা কারা কেটে ফেলে সেখানে দু'তিনখানা টিনের ঘর তুলেছে। কাতুকে জিজ্ঞেস করলাম—এ কি রে? আমাদের সেই নোনা গাছ?

কাতু ঠোঁট উলটে বল্লে—সে হয়ে গিয়েছে—

—হয়ে গিয়েছে মানে?

—এখানে যে নতুন লোক এসে ঘর বেঁধেছে। মামারবাড়ি ছিলে, দেশের খবরই বা কি রাখো?

—কে রে?

—অনেক দূরে কোথায় থাকতো, সেখান থেকে উঠে এসেছে।

—ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ। নাম সত্য চক্রবর্তী।

—চল গিয়ে দেখে আসি—ছেলেপিলে আছে আমাদের বয়সী?

—দু'জন আছে। ভাব হয়ে গিয়েছে আমাদের সঙ্গে। নিন্তু আর পটল। ভারি ফরসা দেখতে, আর হিন্দি-মিন্দি বলে—

আমি মজা দেখতে নতুন বাড়ির উঠোনে ঢুকলাম। আমার বড় দুঃখ হচ্ছিল, অমন নোনা গাছটা, যাতে নোনা পেকে গাছ আলো করতো,যা একটা খেলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যেতো, সেই অমন নোনা গাছটা এরা কেটে ফেলে কি কাণ্ড করেছে দেখো দিকিনি!

বাড়িতে ঢুকতেই দেখি খুব ফরসা একটি দাড়িওয়ালা লোক পশ্চিমদিকের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছেন। কাতু বল্লে—দাঁড়া, ওই সত্য চক্কত্তি। বড্ড রাগী লোক।

—বকবে?

—বকে, বাড়ি ঢুকতে দেয় না।

সাহস করে আর একটু এগিয়ে যেতেই সত্য চক্কত্তি আমাকে দেখতে পেয়ে বল্লে—কে?

আমি সাহস সঞ্চয় করে বল্লাম—আমি।

—আমিটা কে?

—আমার নাম তোতন। এই গাঁয়ে বাড়ি।

—ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ।

—বাপের নাম কি?

—শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়।

—ও, অনাদিদাদার ছেলে তুমি? কবে এলে? এখানে তো তোমরা ছিলে না?

—কাল এসেছি।

—বেশ, এখন যাও, বাড়িতে ছেলেরা কেউ নেই। সব পাঠশালায় গিয়েছে পড়তে। তোমরা পড়াশুনো কর না বুঝি? এ গাঁয়ে ছেলেরা সব খেলেই বেড়ায়!

আমার রাগ হোল। আমি পড়িনে, উনি কি করে জানলেন? যাক বাবা, যাবো না ওদের বাড়ি। ওদের বাড়ি না গেলে কি ভাত হজম হবে না?

এইভাবে প্রথম সত্য চক্কত্তিদের সঙ্গে আলাপ হোল। সত্য চক্কত্তির দুই ছেলে নিন্তু আর পটলের সঙ্গে কী ভাবই হয়ে গেল আমাদের। বেশ ছেলে ওরা, দেখতেও যেমন, লেখাপড়াতেও তেমনি। আমরা একসঙ্গেই পাঠশালায় আর স্কুলে পড়লাম। ওদের বাড়িতে সর্বদা যাতায়াত করি। কিন্তু সুখ ছিল না ওদের বাবা সত্য চক্কত্তির জন্য।

কি মারই ছেলেদের দিত লোকটা! সারা বাল্যকাল নিন্তুদা আর পটলের প্রাণে সুখ ছিল না,মনে সুখ ছিল না। কি কড়া শাসনের ওপরই সর্বদা রাখতো বাবা ওদের। পান থেকে চুন খসেছে কি দুড়দার মার। সেবার আমি, নিন্তু আর পটল খেলা করছি, এমন সময় কি নিয়ে নিন্তুদার সঙ্গে পটলের ঝগড়া বাধলো। নিন্তুদা বল্লে—তুই আমার বড় পেনসিলটা নিলি তখন, ফেরত দে—

পটল বল্লে—তুমি আমার খাতা ছিঁড়ে দিয়েছে দাদা, পেনসিল দেবো না—

—আলবৎ দিবি।

—কক্ষনো দেবো না

—এই নে, এই নে—বাঁদর কোথাকার! বলেই নিন্তু বসিয়ে দিলে দুই চড়।

তুমিও এই নাও—এই নাও, বলে পটলও কষিয়ে দিলে আরো দুই চড়।

এমন সময়ে ওদের বাবা সত্য চক্কত্তি অগ্নিমূর্তিতে ঘরে ঢুকে বল্লেন—কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? এই রকম করে পড়া হচ্ছে বুঝি? শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ বাধিয়েচ দেখছি! বলেই দু'জনকে সে কি দুড়দাড়িয়ে মার। গরুকেও মানুষ অমন মার মারে না। নিন্তুদা তো মার খেয়ে উঠোনে এসে ছিটকে পড়লো, পটল কোণে গিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালো কাঁপতে কাপতে। আমি সরে পড়লাম বেগতিক বুঝে। এই রকম দেখে এসেছি সারা বাল্যকাল। নিন্তুদা আর পটল বাপের ভয়ে জুজু। কোনো জায়গায় ইচ্ছামতো খেলতে যাওয়ার জো নেই।

নিন্তুদার বিয়ে হল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। ওদের সকলের ছোটভাই পিন্টুর বয়স এই সময় বছর চারেক। আমি আই.এ. পড়ি কলকাতায়। বিয়ের চিঠি পেয়ে বাড়ি এলাম। নিন্তুদার বিয়ে, আমোদ-আহ্লাদ করা যাবে। নিন্তুদা ডাক্তারি পড়ে, ভালো ছেলে কলেজের।

পটল গিয়ে ওর বাবাকে বল্লে—বাবা, দাদা বলছে পকেট-ঘড়ি নেবে না।

সত্য চক্কত্তি বিস্ময়ের স্বরে বল্লেন—অ্যাঁ? কি?

—বলছে পকেট-ঘড়ি নেবে না। আজকাল রিস্ট ওয়াচের রেওয়াজ হয়েছে, পকেট-ঘড়ি কেউ পরে না—তাই বলছিল—

—পরে না? কোথায় গেল সে হারামজাদা, ডাকো ইদিকে—

নিন্তুদা তো সঙ্কুচিত ভাবে সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখ চুন হয়ে গিয়েছে ভয়ে।

সত্য চক্কত্তি বল্লেন—তুমি পকেট-ঘড়ি নেবে না? বড্ড তালেবর হয়েছ বুঝি? বাপের কথার উপর কথা। বজ্জাত পাজি, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব, জানো? যাও, তোমার বিয়ে করতে হবে না—তুমি কালই কলকাতায় চলে যাও—

সেদিন বাড়িতে লোকজনের ভিড়, শাঁখ বাজছে, নান্দীমুখের চাল কোটা হচ্ছে। চেঁচামেচি শুনে ওদের মা বার হয়ে এলেন। এসে ছেলের পক্ষ হয়ে স্বামীকে দু'কথা শোনালেন।

—তোমার না হয় তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে—কিন্তু দুধের ছেলে, ওর অত হিসেবজ্ঞান এখনো হয়নি তোমার মতো। আজকের দিনে বাছাকে কোনো কথা বলতে পারবে না বলে দিচ্ছি—

—অত বড় কথা বলতে ওর সাহস হয়? আজকাল কালে কালে সব হচ্ছে কি?

—অত তোমাকে দেখতে হবে না। যাও, বাইরে গিয়ে বসো খানিকক্ষণ।

নিন্তুদা সেযাত্রা রেহাই পেল।

আমাকে বিয়ের পর নিন্তুদা দুঃখু করে বলেছিল—দেখলি তো ভাই বাবার রাগ! একটা হাতঘড়ির কথা বলতে গেলাম, তা বাবা—

আমি বল্লাম—বাদ দে। গুরুজনদের কথায় দুঃখু করতে নেই।

—বাবা বোঝেন না, একটা হাতঘড়ি থাকলে আমাকে কেমন মানাতো!

—এর পর কিনে পরিস। নে এখন।

দিন চলে যেতে লাগলো। দেখতে দেখতে বিশ বছর কেটে গেল। পঁচিশ বছর কেটে গেল। তখনকার বালক এখন যৌবনের সীমা পার হতে চলেছে।

দেশে এসেছি অনেক দিন পরে। অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে দেশের। যেখানে আগে কোঠা-বাড়ি দেখেছি, এখন সেখানে ভাঙা ইটের স্তুপ আর জঙ্গল। বাড়ির লোক মরে-হেজে গিয়েছে, যারা বেঁচে আছে, তারা বিদেশে চাকরি করে—দেশে যাতায়াত নেই। আগে যাদের হীন অবস্থা দেখেছি, এখন তারা অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে, বাড়িতে তাদের গোলাপালা, গরুবাছুর। ভাতের অভাব নেই বাড়িতে। এইরকম এক গৃহস্থের বাড়িতে সকালবেলা বেড়াতে গেলাম।

এ বাড়ির কর্তাকে ছেলেবেলায় আমি দেখেছি। নাম ছিল মাধব পণ্ডিত। এঁরা গোয়ালার বামুন, অর্থাৎ গোয়ালাদের বাড়ি দশকর্ম ও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে অতি কষ্টে পরিবারের অন্নের গ্রাস সংগ্রহ করতেন পণ্ডিত মশায়। এদের একখানা চালাঘর দেখেছি ছেলেবেলায়, তখন মাধব পণ্ডিতের বড় ছেলে জয়কেষ্ট (আমার বয়েসী) খিদের জ্বালায় সকালবেলা পাকা বীচে শসা খেতো মায়ের কাছ থেকে চেয়ে, কুট্‌নোর থালা থেকে তুলে নিয়ে। পণ্ডিতমশাই কোঁচড়ে করে চাল আনতেন প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে ধার করে,তবে হাঁড়ি চড়তো। মাধব পণ্ডিত কুলের অম্বল বড় ভালোবাসতেন। একদিন আমার বেশ মনে আছে, জয়কেষ্ট আর তার বোন নন্দি দু'জনে এক কোঁচড় কুল পেড়ে নিয়ে এল মাঠ থেকে। ওরা পা বিছিয়ে কুল খেতে বসলো রান্নাঘরের দাওয়ায়, কারণ ওদের সদাই খিদে। আমি মুখ ফুটে চাইলাম, আমার হাতে জয়কেষ্ট গোনা একটা কুল দিলে। নন্দি বল্লে—ও কি দাদা, একটা দিতে নেই, আর একটা দে?

—তোর ভাগ থেকে দে না—

নন্দি আমাকে একমুঠো কুল দিলে। আজও তার সেই দরাজ হাতের কথা আমার মনে পড়ে বেশ।

এমন সময়ে মাধব পণ্ডিত কোথা থেকে এসে ছেলেমেয়েদের কোঁচড়ে কুল দেখে বলে উঠলেন—বেশ, বেশ। কুল কোথায় পেলি? আর খাসনে, রেখে দে। কুলের অম্বল হবে।

জয়কেষ্ট বল্লে—না বাবা, আমরা খাবো—

নন্দি বল্লে—চুপ করো দাদা। বাবা কুলের অম্বল ভালোবাসে, তুমি জানো না? না বাবা, আমরা আর কুল খাবো না। মাকে দিয়ে আসছি অম্বল করতে। কিন্তু গুড় নেই, বলো অম্বল হবে কি দিয়ে?

মাধব পণ্ডিত মুখ চুন করে বল্লেন—ও গুড় নেই! তবে আর কি হবে?

আমি তখনি উঠলাম। আমাদের বাড়ি অনেক গুড়-পাটালি আছে, কারণ আমাদের উনিশটা খেজুর গাছ কাটা হয় প্রতি বছর। মাকে গিয়ে বলতেই মা খানিকটা পাটালি দিলেন। আমি নন্দিদের বাড়ি এসে সেই পাটালি নন্দির মা'র হাতে দিয়ে বল্লাম—পণ্ডিত কাকাকে কুলের অম্বল করে দিয়ো কাকিমা।

আর আজ তাদের পরিবর্তন দেখে অবাক হতে হবে।

জয়কেষ্ট পাটের ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। একতলা কোঠাবাড়ি, টিউব কল, শান বাঁধানো উঠান, গোয়ালে আট-দশটা ভালো ভালো গাইগরু, ধানের গোলা—আমি দেখে অবাক। জয়কেষ্ট এখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, চিনি, কাপড় দেওয়ার কমিটির সেক্রেটারি, শিক্ষা-কর আদায় করবার কর্তা। লোকে মানে, চেনে, ভয় করে। না করলে উপায় নেই, তোমার শিক্ষাকর বাড়লো, চিনির বরাদ্দ কমলো, কাপড় দু-তিন চালান পাওয়া গেল না। জয়কেষ্টকে এখন গ্রামের লোক বলে বড়বাবু। মাধব পণ্ডিত অনেকদিন মারা গিয়েছেন শুনলাম। সংসারের সুখভোগ তার অদৃষ্টে ছিল না। কিন্তু সকলের চেয়ে পরিবর্তন হয়েছে নিন্তুদা'দের বাড়িতে।

জয়কেষ্ট চা খাওয়াতে খাওয়াতে আমাকে সব বল্লে।

নিন্তুদা এখানে থাকে না, শহরে কোথায় চাকরি করে। ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানেই থাকে। পটল এখন রেলে কাজ করে,স্ত্রী-পুত্র নিয়ে লালমণির হাটে থাকে রেলের বাসায়। বাড়িতে আছেন শুধু সত্য চক্কত্তি, আর ছোট ছেলে পিন্টু। এখন অবিশ্যি তার বয়স ত্রিশ বছরের ওপর।

আমি বল্লাম—পিন্টু চাকরি করে না?

—চাকরি করবে কি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে! বাড়িতে থাকে আর পাগলামি করে!

—সত্য চক্কত্তি কিছু বলেন না?

—সত্য চক্কত্তি আর সে সত্য চক্কত্তি নেই। এখন তিনি ছেলের ভয়ে জুজু। তাঁকে পর্যন্ত এক-একদিন মারতে যায়।

আমি অবাক হয়ে বল্লাম—সে কি! সত্য কাকাকে?

—হ্যাঁ। জিনিসপত্র ফেলে ভেঙে চুরমার করে। চালডাল-ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দেয়। ওই দেখো না আমার বাড়িতে ওই কালই বস্তাবন্দী করে রেখে গিয়েছেন, ওঁর ঘরে রাখলে পিন্টু বিক্রি করে ফেলবে, নয়তো নষ্ট করে ফেলবে।

—কেউ কিছু বলে না?

—কে বলবে? পাগলকে কে রাগাতে যাবে? গিয়ে দেখ সেখানে, তাহলেই বুঝতে পারবে।

কিছুক্ষণ পরে গেলাম সত্য চক্কত্তি মশায়ের বাড়ি। তিনি দেখি চুপচাপ বসে তামাক টানছেন। কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পরে চারিদিকে সন্ত্রস্তভাবে তাকিয়ে দেখে বল্লেন—আর বাবা, আমার থাকা না থাকা! আমার যে কি কষ্ট বাবা! পিন্টু আমাকে কোনো জিনিস খেতে দেয় না...চালডাল দেখো ওই ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে...আমার কোনো জিনিসে হাত দেবার জো নেই...আর...

হঠাৎ সত্যকাকা চুপ করে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিন্টু কোথা থেকে এসে বলে উঠলো—কি বলা হচ্ছে আমার নামে? কি বলা হচ্ছে বুড়োর? আমি খেতে দিইনে? আমি চালডাল চাবি দিয়ে রাখি? রাখিই তো, না হোলে তুমি বিক্রি করে মেরে দাও। তোমাকে আর আমি জানিনে, বুড়ো ঘুঘু?

আমি বলে উঠলাম—ছি ছি, এসব কি হচ্ছে পিন্টু? উনি তোমার বাবা না? বাবাকে ওই সব বলতে তোমার মুখে বাধে না?

ও বল্লে—উনি বাবা, তাই কি? আমি ও সব মানিনে। আমার যা খুশি তাই করবো।

—তা বলে ওঁকে তুমি খেতে দেবে না? ঘরে চাবি দিয়ে রাখবে?

পিন্টুর বাবা বল্লেন—আর বাবা আমাকে—

পিন্টুর ধমক খেয়ে কথা শেষ করতে পারলেন না। পিন্টু হেঁকে বলে উঠলো–চুপ—

আমি বল্লাম—ও কি পিন্টু?

—কিছু না। উনি বাজে কথা বলছেন—

—আর তুমি খুব ভালো কথা বলছো? বাবাকে এ-সব কথা বলতে হয় কোথায় শিখলে? ওকে ধমক দিয়ে তখনকার মতো চুপ করিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু বুঝলাম এ রোগের ওষুধ এত সহজে হবে না। বৃদ্ধ সত্য চক্কত্তির জন্যে দুঃখ হোল, সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সত্য চক্কত্তি, যার ভয়ে ছেলেরা জুজু হয়ে থাকতো।

তারপর যে কদিন দেশে ছিলাম বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বসতাম। কি অদ্ভুত পরিবর্তন তাঁর দেখে অবাক হয়ে যেতাম। এদিক ওদিক চেয়ে ফিসফিস করে কথা বলেন। ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত, ছেলের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পর্যন্ত করতে ভরসা পান না। আমি তাঁকে বল্লাম—নিন্তুদা কোথায় থাকে, সেখানে গিয়ে থাকেন না কেন? কিংবা পটলের কাছে লালমণির হাটে?

বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—সে সব জায়গায় মন টেঁকে না বাবা। নিন্তুর বাসায় জায়গা কম, লোকজনের ভিড়। পটলের তো রেলের কোয়ার্টার, পাখির খাঁচা। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, হাত-পা ছড়িয়ে থাকা অভ্যেস,সে সব জায়গায় হাঁফ লাগে আমার। নইলে তাদের দোষ নেই, তারা নিয়ে যেতে চায়। তা আমার নিতান্ত খারাপ অদৃষ্ট বাবা, আমি কি ছিলাম, আজ কি হয়েছি তাই দ্যাখো! তোমার কাকিমাও যদি আজ বেঁচে থাকতো, তাহলে বুড়ো বয়সে আমাকে ছোট ছেলের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়?

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার মতো কিছু কথা খুঁজে পেলাম না।